চাষবাস

আবহাওয়া

১৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রযোজ্য আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা:

আগামী ১৪ ও ১৫ তারিখে বিক্ষিপ্তভাবে হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। পরের তিন দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭.৮ থেকে ২৯.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.০ থেকে ১৯.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আগামী দুই দিন আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন ও পরের তিন দিন আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫২ থেকে ৮০ শতাংশ এবং বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৪ থেকে ৫৯ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বইতে পারে।

ডাকবাক্স

চিঠি পাঠান: চাষবাস
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২
নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল
chashbas@sangbadpratidin.in

পটাশিয়ামে পুষ্টি

ফসলের যথাযথ পুষ্টির উপর নির্ভর করে রোগপোকার আক্রমণ সহ্য বা প্রতিরোধ করার করার ক্ষমতা। সুষম পুষ্টি ফসলের রোগপোকা সহনশীলতার বংশগত ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এইকাজে পটাশিয়ামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্ভিদ পুষ্টিগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন ফসলের বৃদ্ধি ঘটায়, ফসলের কলা ও অঙ্গগুলিকে নরম ও সরস করে তোলে। কোষে দ্রবণীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলে অনেক সময় এসব ফসলে রোগপোকার আক্রমণ বাড়ে। পটাশিয়াম অনেকটা এর বিপরীত ক্রিয়া ঘটায়। ফসলের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তাকে রোগপোকা সহনশীল করে তোলে। যথেষ্ট পটাশিয়াম পুষ্টিতে জীবাণুর রোগ সৃষ্টিকারী এনজাইম গুলির ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া ফেনোলিকস উৎপাদক বিটা গ্লুকোসাইডেজের সক্রিয়তাও বাড়ে। দেহে ফেনলিকস বেড়ে গেলে রোগজীবাণু ওই ফসলকে আক্রমণ করতে পারে না।

ধানে নাইট্রোজেনের সঙ্গে পটাশিয়াম পুষ্টি দেওয়া হলে ওই ফসলে বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ কমে যায়। বেশি নাইট্রোজেন দিলে গাছে অ্যামিনো অ্যাসিড বেড়ে পোকার আক্রমণ বাড়ায়। বেশি পটাশিয়াম দিলে বেশি প্রোটিন তৈরি হয় গাছে। কিন্তু অ্যামিনো অ্যাসিড ও রিডুইসিং শর্করা কমে যায় কোষে। কোষ এবং কলার আবরণ আরও শক্তপোক্ত করতেও পটাশিয়াম সাহায্য করে। ফলে শোষক পোকাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধিও কমে যায়। ধানের রোগ-পোকা দমনে এই তত্ত্বটা কাজে লাগানো যায়। ধানের কাণ্ড ও পাতার গায়ে যেসব রোগের আক্রমণ হয় যেমন খোলাপচা, ডাঁটাপচা, ঝলসা সেসবও এই পদ্ধতিতে কমানো যায়। এছাড়াও আলু, সবজি, লঙ্কা, পেঁয়াজ, টম্যাটো প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সার দেওয়ার সময় পটাশিয়াম সারের পরিমাণ বাড়িয়ে রোগ-পোকার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সম্ভব।

(অধ্যাপক অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে কল্যাণীর অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কর্তৃক প্রকাশিত)

পোকা নিধনে লিচুতে প্রাপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও দক্ষিণের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে ভাল লিচুর চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে লিচুর প্রধান কীট শত্রু হ'ল লিচুর পাতা মোড়া পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা ও লিচুর মাকড়।

লিচুর পাতা মোড়া পোকা

পূর্ণাঙ্গ মথ কচিপাতায় ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরোনোর পর কীড়া কচি বাদামি রঙের পাতাকে চোঙের মতো মোড়ে। মোড়া পাতার মধ্যে থেকে কীড়া কচি পাতা গুলোকে খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত পাতাগুলি বাদামি রঙের হয়ে শুকিয়ে যায়। জুলাই-আগস্ট মাসে এই পোকার আক্রমণ বেশি হয়। লিচু গাছে কচি পাতা এবং যখন ফুল ধরে তখন এই পোকার কীড়া নতুন পাতা ও ফুলের মঞ্জরিগুলিকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে থাকে এবং নতুন ফুল এবং পাতা খায়। কীড়াগুলি এই পর্যায়ে, কচি ফলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বীজ খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত ফল গাছ থেকে ঝরে পরে।

প্রতিকার: জুন-জুলাই মাসে আক্রান্ত পাতা (কীড়া সহ মোড়া পাতা) সুদ্ধ ডগা গুলি ভেঙে নষ্ট করে ফেলতে হবে। এরপর গাছ প্রতি ১ কেজি নিম খোল এবং প্রয়োজনে নোভালিউরন ১০ ইসি (১.৫ মিলি/লিটার জলে) বা স্পিনোসাড ৪৫ এসসি (০.৪ মিলি/লিটার জলে) স্প্রে করুন।

লিচুর ফল ছিদ্রকারী পোকা

এই পোকা প্রধানত লিচুর ফলকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফলের বোঁটা ছাড়ালে বোঁটার গোড়ায় ছোট সাদা রঙের কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। এই পোকা বীজের গোড়া খায় এবং আঁটিতে ছিদ্র করে ফলের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রান্ত ফলের বোঁটার দিক থেকে পোকায় খাওয়া অংশ গুঁড়ো হয়ে বের হতে দেখা যায়। ফল পাকা পর্যন্ত বীজ বা আঁটির মধ্যে পোকা থেকে যায়। আক্রান্ত ফল খাওয়ার অনুপোযোগী হয়ে যায়। অন্য সময়ে এই পোকা গাছের পাতার মধ্য শিরা বরাবর আক্রমণ করে এবং পাতার মধ্য থেকে সবুজ অংশ খায়। ফলে আক্রান্ত পাতা লাল হয়ে শুকিয়ে যায়। ফল যখন খুব ছোট থাকে তখন এই পোকায় আক্রান্ত ফল ঝরে পড়ে।

প্রতিকার: যে অঞ্চলে এই পোকার নিয়মিত আক্রমণ হয়, সেখানে পুষ্প মঞ্জরি বেরোনোর সময় নিম তেল (৪ মিলি/লিটার জলে) স্প্রে করলে পোকা ডিম পাড়তে বাধা পায়। এছাড়াও, গুটি ধরার ১০ দিন, ২৫-৩০ দিনের মাথায় এবং প্রয়োজনে ফল পাড়ার দিন দশেক আগে নোভালিউরন ১০ ইসি (১.৫ মিলি/ লিটার জলে) বা ইমামেক্টিন বেনজয়েট ৫% এসজি (০.৪ মিলি/লিটার জলে) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে করতে হবে।

লিচুর মাকড়

পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ মাকড় পাতার তলা থেকে রস শুষে খায়। এর ফলে পাতা গুটিয়ে যায়। পাতার নীচের দিকে বাদামি রঙের ভেলভেটের মতো একটি পুরু আস্তরণ পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে অনেক সময় পাতা অকালে ঝরে পড়ে। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফলন কম হয়। চারা গাছের পাতা ও বড় গাছের কচিপাতা মাকড় আক্রমণের জন্য পছন্দ করে। পাতা ছাড়াও নতুন পাতার কুঁড়ি, পুষ্প মঞ্জরী এবং কচি ফলের খোসার উপরও এদের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। মার্চ মাস থেকে মাকড়ের আক্রমণ শুরু হয়। জুলাই মাসে এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সংক্রমিত ডগায় আর নতুন পাতা বা ফুল আসে না।

প্রতিকার: মাকড় আক্রান্ত পাতা ও শাখাগুলি কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত ফল যেন মাটিতে পড়ে না থাকে। তাছাড়া মার্চ মাস থেকে মাকড় নাশক, যেমন ক্লোরফেনাপির ১০ ইসি বা প্রপারজাইট ৫৭ ইসি ৩ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন মতো ফুল আসার আগেও মাকড় নাশকগুলি প্রয়োগ করুন।

(কল্যাণীর অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কর্তৃক প্রকাশিত)

বাড়তি আয়ের বাজি
মুক্ত বাজরা

পার্ল মিলেট বা মুক্ত বাজরা পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ। এটি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ডায়েটারি ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজগুলির একটি ভালো উৎস। সহজে জন্মানো টেকসই ফসল, যে কোনও শুষ্ক মাটির জন্য উপযুক্ত। সেচ ব্যবস্থাযুক্ত জমিতে ৩০-৩৫ কুইন্টাল দানা প্রতি হেক্টরে এবং বৃষ্টিনির্ভর চাষে ১৫-২০ কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে দানা হয়। উৎপাদনের তুলনায় অধিক চাহিদা তৈরি হয়েছে বিশ্ব বাজারে। মুক্ত বাজরা চাষ করে কৃষক অধিক আয়ের সুযোগ করে নিতে পারেন। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুস্মিতা মঈ ও অধ্যাপক বিকাশচন্দ্র পাত্র।

বাজরা অধিক কার্বোহাইড্রেট ও ফাইবার যুক্ত পুষ্টি গুণ সম্পন্ন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। আগে দেশের সর্বত্র চাষ হলেও বর্তমানে এটি হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে এখনও ভারতের, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে বাজরা সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয়। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ও কিছু জেলা যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এই বাজরা চাষে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বর্তমানে বিশ্বে ভারত সর্বাধিক বাজরা রফতানি করে থাকে। Pearl Millet (মুক্ত বাজরা), বৈজ্ঞানিক ভাবে পেনিসেটাম গ্লুকাম নামে পরিচিত, এটি একটি শস্য ফসল যা ঘাস জাতীয় (Poaceae) পরিবারের অন্তর্গত। এটি ভারত, আফ্রিকা এবং চিন সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে চাষ হয়ে আসছে। বাংলায়, মুক্ত বাজরাকে সাধারণত 'বাজরা' বলা হয়।

এই মুক্ত বাজরা অত্যন্ত নিম্ন মানের। কিন্তু সহজে জন্মানো টেকসই ফসল, যে কোনও শুষ্ক মাটির জন্য উপযুক্ত। এগুলি অত্যন্ত ছোট ঘাসের একটি দল যা সারা বিশ্বে শস্য খাদ্য হিসাবে চাষ করা যেতে পারে। এটি এমন অঞ্চলে চাষ করা যেতে পারে যেখানে অন্যান্য খাদ্য-শস্য প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে চাষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

উদ্ভিদের বিবরণ

মিলেটের মধ্যে, এই মুক্ত বাজরা সব থেকে বেশি চাষ হয়ে থাকে। এটি এক থেকে আড়াই মিটার উচ্চতার ভুট্টা গাছের মতো দেখতে ঘাস জাতীয় খাড়া উদ্ভিদ। নীচের গাঁট থেকে পাশকাটি বের হয়। মূল গুচ্ছাকার, মাটির উপরের গোড়া থেকেও ঠেস মূল বের হয়। পাতা বল্লমের মতো, উপরে ও নীচে অসংখ্য লোম থাকে। পুষ্প বিন্যাস গোল, লম্বা এবং নলাকৃতি হয়ে থাকে। পুষ্প মঞ্জরীতে ফুল গুলি ঘন ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। মঞ্জরীর দৈর্ঘ্য ১৫-৩৫ সেমি পর্যন্ত হয়। মঞ্জরী গায়ে দানা মুক্তোর মত দেখতে হয়।

পুষ্টি গুণ

মুক্ত বাজরা পুষ্টি গুণে পরিপূর্ণ। এটি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ডায়েটারি ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ গুলির একটি ভাল উৎস। মুক্ত বাজরার প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ৩৭৮ ক্যালোরি, ১১ গ্রাম প্রোটিন, ৯ গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার এবং বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ যেমন আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম থাকে।

বাজরার জাত

খাদ্য পুষ্টি বেশি হিসেবে এবিভি-০৪, পুসা কম্পোজিট-৭০১, ধনশক্তি, পিএইচবি-১০, পিএইচবি-১৪, বিকে-২৩০, বিকে-৫৬০, বিডি-১১১, মল্লিকা, নাগার্জুনা খরা সহনশীল। পুষা কম্পোজিট ৪৪৩ নামে নতুন মিশ্র জাত রয়েছে এই-জাতটি জলদি উচ্চ ফলনশীল ও খরা সহনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এছাড়াও এসসিএমভি-১৫৫, ডাব্লুসিসি ৭৫, রাজ-১৭১, পুসা সুপার-৪৫০, পুসা-২৩ ইত্যাদি বাজরার জাত গুলি উল্লেখযোগ্য। এই সব বীজ ন্যাশনাল সীড কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ফর্মে উৎপাদন করা হয় এবং পরে বাজারের বিভিন্ন বীজ দোকানে সরবরাহ করা হয়।

উপযুক্ত আবহাওয়া

প্রায় সব রকম অনুকূল এবং প্রতিকূল আবহাওয়াতেই এই মুক্ত বাজরা চাষ করা যেতে পারে। তবে দানা পরিপক্ক হওয়ার জন্য দিনের বেলায় উচ্চ তাপমাত্রা থাকলে ভাল হয়। খরা সহনশীল হলেও গোটা মরশুম জুড়ে কম-বেশি বৃষ্টিপাত এই মুক্ত বাজরা চাষের জন্য ভাল হয়।

চাষের সময়

বাজরার ভাল ফলন পেতে জল সেচ দরকার। কাছাকাছি সেচের ব্যবস্থা আছে এমন জমিতে বাজরা চাষ করা বাঞ্চনীয়। প্রধানত জুন-জুলাই মাসে (জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়) বাজরা চাষ করা হয়। বাজরা সময় মতো না চাষ করতে পারলে পুনঃরোপণ করেও ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়।

উপযুক্ত মাটি

জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যুক্ত প্রায় সব রকম মাটিতেই বাজরা চাষ হয়ে থাকে। তবে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যুক্ত বেলে দোআঁশ মাটি এই বাজরা চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

জমি তৈরি

বাজরার জন্য ভাল বীজতলা তৈরি করা প্রয়োজন। বাজরার বীজ খুব ছোট, এই কারণে খেয়াল রাখতে হবে বীজ তলার মাটি যেন ঢেলা যুক্ত না হয়। এতে বীজ গজানোতে সমস্যা হবে। তাই দুই থেকে তিন বার লাঙল দেওয়া দরকার। চাষ কমপক্ষে ১৫ সেমির গভীর হলে ভাল। বাজরা চাষের জন্য উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিতে কোনও ভাবেই যেন জল না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বীজ তলার মাটিতে বীজ গজানোর মতো যথেষ্ট রস থাকা দরকার।

বীজের পরিমাণ এবং রোপণ

১ হেক্টর জমির জন্য ৪-৫ কেজি বীজ যথেষ্ট। প্রতিটি সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ৩৫-৪০ সেমি এবং প্রতিটি গাছের মধ্যেবর্তী দূরত্ব ১০ থেকে ১২ সেমি রাখতে হবে। বীজ ২-৩ সেমি গভীরতায় বপন করতে হবে। বাজরার চাষ সাধারণত বীজ ছিটিয়ে করা হয়। এই পদ্ধতি কার্যকর না হলে আলুর মতো করে বপন করাও যেতে পারে। এতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হবে এবং ভাল অঙ্কুরোদগম হবে।

বীজ শোধন

বাজরার বীজ বপনের আগে ২০ শতাংশ লবণের দ্রবণে ডুবিয়ে, পরিষ্কার জলে ২-৩ বার ধুয়ে নিতে হবে। এর পর প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে থিরাম মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। শোধন করা বীজ ছায়ায় শুকিয়ে বপন করতে হবে।

পুনঃরোপণ

তিন সপ্তাহ পর চারা তুলে পুনরায় রোপণ করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, যখন চারা তোলা হয় তখন মাটি ভিজে থাকা প্রয়োজন যাতে শিকড়ে কোনও আঘাত না লাগে। পুনঃরোপনের সময় একটি করে চারা লাগাতে হবে। প্রতিটি সারির দূরত্ব হবে ৫০ সেমি এবং প্রতিটি চারার মধ্যে দূরত্ব হবে ১০ সেমি।

সার প্রয়োগ

সাধারণত মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন কম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সাধারণত বাজরা চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি ফসফেট এবং ৩০-৪০ কেজি পটাশ ব্যাবহার করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

সেচ ব্যবস্থা

প্রধানত, বাজরা বৃষ্টির জলে হওয়া ফসল। যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হলে, সেচ প্রয়োজন হয় না। তবে খরা হলে দুটো সেচ প্রয়োজন হয়। বাজরা জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে না। জল জমলে দ্রুত বের করে দিতে হবে।

আগাছা দমন

আগাছা হল বাজরার সবচেয়ে বড় শত্রু। তারা পুষ্টি, মাটি, আর্দ্রতা, সূর্যালোক এবং স্থানের জন্য ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে যার ফলে ফলন কমে যায়, শস্যের গুণমান কম হয় এবং উচ্চ উৎপাদন খরচ হয়। আগাছা পোকামাকড় এবং রোগেরও আশ্রয় দান করে। অতএব, শুধুমাত্র জমি তৈরির সময় নয়, চাষের ৩ থেকে ৫ সপ্তাহ পর নিড়ানি দিতে হবে। ফুল আসার আগে পর্যন্ত ২-৩ বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এছাড়াও অ্যাট্রাজিন @ ১.২৫ কেজি। হেক্টর হিসাবে, ৪০০-৫০০ লিটার জলের সাথে মিশিয়ে বীজ বপনের ২ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করলে আগাছা নিয়ন্ত্রণে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফলন এবং ফসল সংগ্রহ

প্রাপ্ত বয়স্ক গাছে ২০% আর্দ্রতা থাকে। অর্থাৎ গাছ প্রায় মরে শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। খড় রঙের শস্য দেখা যায়। পুরো গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। অথবা ইয়ার হেড (শীষ) প্রথমে তোলা হয় এবং বাকি গাছ পরে কেটে ফেলা হয়। থ্রেশার বা মাড়াই মেশিন দিয়ে শীষ থেকে দানা বের করা হয় এবং এরপর বাতাসের বিপরীতে ধরে বা কুলো দিয়ে ঝাঁকিয়ে অথবা ফ্যানের বাতাসে খোসা ওড়ানো হয়। সেচ ব্যবস্থা যুক্ত জমিতে ৩০-৩৫ কুইন্টাল দানা প্রতি হেক্টরে এবং বৃষ্টি নির্ভর চাষে ১৫-২০ কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে দানা হয়। দানা গুলো রোদে ভাল ভাবে শুকনো করা প্রয়োজন এবং সংরক্ষণের জন্য ফসলের দানার আর্দ্রতা কমিয়ে ১২-১৪% করে নেওয়া দরকার।বাজরা দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ধরনের খাদ্য তালিকাগত ফাইবার সমৃদ্ধ একটি খাবার। এতে সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে (১২.৫%)। রান্না করা বাজরার এক কাপ পরিবেশন করলে প্রায় ২০৭ ক্যালোরি শক্তি সরবরাহ করে। বাজরা রুটি, বিয়ার, অন্যান্য খাবার তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য সচেতনার কথা মাথায় রেখে বর্তমানে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ছে এবং রফতানি হচ্ছে বিদেশে। উৎপাদনের তুলনায় অধিক চাহিদা তৈরি হয়েছে বিশ্ব বাজারে।

মাটি-মানুষের পুষ্টি ডালে

ডালে ১৭- ৪২ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সুতরাং উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের এটি একটি মূল উৎস। ডালজাত খাদ্যসামগ্রীও খাদ্যরসিকদের কাছে সমাদৃত। ডালের দামও অনেক বেশি পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও ডাল চাষের প্রসার আশানুরূপভাবে হচ্ছে না। বিশ্ব ডাল দিবস পালিত হয়েছে কয়েকদিন আগে। ডাল চাষে মাটির স্বাস্থ্য ফেরে। মানুষের পুষ্টিতে সহায়তা করে ডাল। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অধ্যাপক অমিতাভ বিশ্বাস

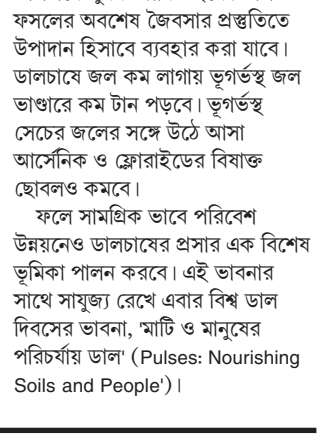

সারা পৃথিবী জুড়ে ১০ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় বিশ্ব ডাল দিবস। খাদ্য হিসাবে ডালশস্য গ্রহণের উপযোগিতা ও ডালশস্য চাষের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করাই এর উদ্দেশ্য। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা বিশ্ব ডাল দিবস হিসাবে ১০ ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করে। যা প্রথমবার পালিত হয় ২০১৯ সালে। তারপর থেকে প্রতিবছর এই দিনটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ব ডাল দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

ডাল চাষের এলাকা বাড়ানো ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা দ্রুতহারে বাড়ছে না। পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ ডালশস্য উৎপাদন হয় তা মোট চাহিদার মাত্র ১৫-২০ শতাংশ মেটাতে পারে। সুস্বাদু ও খাদ্যগুণের জন্যই মূলত ডালের চাহিদা। ডালে ১৭- ৪২ শতাংশ প্রোটিন থাকে। সুতরাং উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের এটি একটি মূল উৎস। ডালজাত খাদ্যসামগ্রীও খাদ্যরসিকদের কাছে সমাদৃত। ডালের দামও অনেক বেশি পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও ডাল চাষের প্রসার আশানুরূপভাবে হচ্ছে না। এছাড়াও ডালচাষের ফলে শিকড়ে থাকা অর্বুদে বসবাসকারী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া জমির মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ফলে ডালজাতীয় শস্য জমির স্বাস্থ্য ও ভাল করে।

এত গুণ থাকি সত্ত্বেও ডালচাষ কৃষকদের কাছে সমাদৃত হয়নি। বরং একটা কথা প্রচলিত ছিল যে ডালচাষি মাঠে মাত্র দুবার যান- একবার বীজ ছড়াতে আর একবার ফসল কাটতে। মাঝে কোনও পরিচর্যা নেই। যদিও কথাটা রসিকতার ছলে বলা, তবুও এটা সত্যি যে ডাল চাষে যথেষ্ট যত্নের অভাব দেখা যায় এবং তার প্রভাব পড়ে ফলনে। লাভ কম হয়। চাষি আরও আগ্রহ হারান। চাষের এলাকাও তাই বাড়ে না।

ফলন কমার অন্যতম কারণ হিসাবে বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যে বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছেন তার এইরূপ

উন্নত মানের, রোগপোকা সহনশীল এবং ধারাবাহিকভাবে উচ্চ ফলন দিতে পারে এরকম বীজের যোগানের অভাব। উন্নত চাষ পদ্ধতির সুপারিশ অনুসরণ করে চলতে অনেক কৃষক অনাগ্রহী। অনুর্বর জমিই সাধারণত ডালচাষের জন্য বরাদ্দ থাকে। সেখানে ফলন কম হয়। দীর্ঘমেয়াদি ধান কাটার পর ডালবীজ লাগাতে দেরি হয়ে যায় ফলে ফসল অনেক বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সামনে পড়ে ও ফলন কমে। জীবানুসার ব্যবহার না করা, সময়ে আগাছা পরিষ্কার না করা, সুসংহত উপায়ে রোগ কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ফলন কমে। এর সামগ্রিক প্রভাব পরে ডালচাষের অনাগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায়।

তাদের ডালচাষে আগ্রহী করে তুলতে প্রয়োজন সচেতনতা প্রসার কর্মসূচী। এই কর্মসূচিরই অঙ্গ হল "বিশ্ব ডাল দিবস পালন" কর্মসূচি। ডালের গুণাগুণ জানলে মানুষ খাদ্য তালিকায় ডালকে গুরুত্ব সহকারে রাখবে। সুস্বাদু ডালজাত যুক্তমূল্য (value added) খাদ্য ও বাজারে ডালের চাহিদা বাড়াবে। সরকারী বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ও সহায়তায় উন্নত প্রথায় কৃষক ডাল চাষে করবে। চাষি নিজের প্রাত্যহিক খাদ্য- তালিকায় ডালকে ঢোকানোয় তাদের পারিবারিক স্বাস্থ্য ভাল হবে। এছাড়াও প্রায় বন্ধ্যা হতে বসা জমি, ডালচাষে পুনরুজ্জীবিত হবে। ডাল ফসলের অবশেষ জৈবসার প্রস্তুতিতে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ডালচাষে জল কম লাগায় ভূগর্ভস্থ জল ভাণ্ডারে কম টান পড়বে। ভূগর্ভস্থ সেচের জলের সঙ্গে উঠে আসা আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের বিষাক্ত ছোবলও কমবে।

ফলে সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ উন্নয়নেও ডালচাষের প্রসার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই ভাবনার সাথে সাযুজ্য রেখে এবার বিশ্ব ডাল দিবসের ভাবনা, 'মাটি ও মানুষের পরিচর্যায় ডাল' (Pulses: Nourishing Soils and People')।